Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল ইসলামের ‘মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বপ্না রায়
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.6
Pages	145-158
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস

স্বপ্না রায়

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মূলত কবি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পর বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মৌলিক কবি-প্রতিভার অধিকারী তিনি। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও রবীন্দ্র-বলয়ে শৃঙ্খলিত না হয়ে, কাব্যক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজন করেন তিনি। বস্তুত, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে, যথার্থ অর্থে, তিনিই প্রথম জনজীবনের সঙ্গে কবিতার প্রগাঢ় সম্পর্ক নির্মাণ করেন; নজরুলই প্রথম রাজনীতিকে শিল্পে রূপান্তরিত করেন। কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নয়, কথাসাহিত্যেও নজরুলের এই স্বাতন্ত্র্য সবিশেষ লক্ষযোগ্য। মৌল-বক্তব্য, চরিত্র-চিত্রণ, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, ভাষার মাধুর্য এবং শৈল্পিক সৃষ্টি-মাহাত্ম্যে তাঁর কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস, কবিতার মতোই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী।[১] নজরুলের উপন্যাসে মূলত শিল্পরূপ পেয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-নৈরাশ্য, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ আর বিদ্রোহ-বিক্ষোভ—সব কিছু মিলে যুদ্ধোত্তর বাংলার জীবন।

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানস-সন্তান। একদিকে ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের আশাবাদে প্রাণিত হয়ে নজরুল যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের মাঝেও কবিতার মতোই, উপন্যাসে আশাবাদী এবং স্বাধিকার-প্রমত্ত মানস-ভাবনা প্রকাশ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি ঘটনা নজরুল-মানসে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। নজরুলের উপন্যাসে এই সংক্ষোভময় যুগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> ...যুগের মানস-চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ কবি হিসেবে নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে মুখরিত করে

তুলেছিলেন আর তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে এঁকেছিলেন এ-যুগেরই জীবন্ত প্রতিরূপ। বাংলার যে অক্ষয় যৌবন এ-কালে মুক্তি-কামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আযাদীকে ত্বরান্বিত করবার জন্য যে তরুণ-তরুণীরা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, দেশপ্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনা-লেখ্য রচনা করেছেন নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে।[২]

কবিতা ও গানে নজরুলের সৃষ্টি-সম্ভার যথেষ্ট ঋদ্ধ হলেও, তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন মাত্র তিনটি— 'বাঁধনহারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এবং 'কুহেলিকা' (১৯৩১)। উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে 'মৃত্যুক্ষুধা' শ্রেষ্ঠ রচনা। আমরা তাই নজরুলের ঔপন্যাসিক-প্রতিভার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারে 'মৃত্যুক্ষুধা'র মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস আলোচনায় আমরা প্রথমেই নজরুলের জীবন-ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বের দিকে চোখ ফেরাব। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের বিদ্রোহাত্মক কবিতার জন্য নজরুল এক বছর তিন মাস কারাজীবন ভোগ করেন (১৯২২-২৩)। কারাজীবন ভোগ শেষে ১৯২৪ সালে নজরুল প্রমীলাকে বিবাহ করেন এবং সস্ত্রিক হুগলীতে বসবাস করতে থাকেন। এ-সময় কংগ্রেস নেতা হেমন্তকুমার সরকারের সান্নিধ্যে এসে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ক্রমশ সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ-পর্বেই তিনি কংগ্রেসের অঙ্গ-সংগঠন 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দল' গঠন করেন (১৯২৫)। 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলে'র মুখপত্র সাপ্তাহিক 'লাঙ্গলে'র প্রধান পরিচালকরূপে নিযুক্ত হন কাজী নজরুল ইসলাম। পরে ১৯২৭ সালে 'লাঙ্গল' 'গণবাণী' নাম ধারণ করে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে'র সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে মুযফ্‌ফর আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে। 'গণবাণী'র সঙ্গেও নজরুলের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।[৩] রাজনৈতিক প্রয়োজনে হেমন্তকুমার সরকার ১৯২৬ সালে নজরুলকে সপরিবারে হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক নামক মুসলিম-খ্রীস্টান অধ্যুষিত এলাকায় নজরুল সপরিবারে প্রায় চার বছর (১৯২৬-২৯) অবস্থান করেন। এই চার বছরের জীবন-অভিজ্ঞতা নিয়ে নজরুল নির্মাণ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'।

নজরুল কবিতায় যে সাফল্য ও সিদ্ধি অর্জন করেছেন, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা অর্জন করতে পারেননি। কাহিনী-বিন্যাসে শৈথিল্য, অবয়ব-সংগঠনে অসতর্কতা এবং প্রকরণ-প্রসাধনে অমনোযোগিতা থাকলেও বিষয়-গৌরবে নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। জীবনদৃষ্টির প্রাতিস্বিকতায় নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবীদার। এ-উপন্যাসের মাধ্যমে নজরুল গেয়েছেন মানবতার জয়গান ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মহিমা ও মাহাত্ম্যই এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

অবয়ব-সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 'মৃতুক্ষুধা' উপন্যাসে স্পষ্টতত দুটো পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অংশের কাহিনী কৃষ্ণনগর শহরের চাঁদ সড়কের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে ; আর দ্বিতীয় অংশের কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে নিরন্ন-নিপীড়িত মানুষ আর সংক্ষুব্ধ কলকাতার জীবনচিত্র। উপন্যাসে এই দুটি স্রোতের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেছে একটি মাত্র চরিত্র—প্যাঁকালের ভাবী বিধবা-মেজবৌ। কিন্তু যে কেন্দ্রানুগ শক্তি উপন্যাসের সকল কাহিনীকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, মেজবৌ পালন করতে পারেনি সে-কেন্দ্রানুগ শক্তির ভূমিকা। তবে উপন্যাসে নজরুল এই দুটো ভিন্নধর্মী কাহিনীর যে সংমিশ্রণ করেছেন, তা একই মানস-উদ্ভূত এবং একই প্রেরণা-সম্ভূত। সমাজ ও ধর্মের অবজ্ঞা, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে মানুষের জীবনে যে সীমাহীন বেদনা-যন্ত্রণার জন্ম হয়, উপন্যাসের দুটি পর্বে তাই অদৃশ্য সেতুবন্ধকের ভূমিকা পালন করেছে।[৪]

কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের পাশে একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে ধুঁকে মরছে এবং এ-ঘরেরই এক বিধবা বৌ ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি পেয়েছে, তার নিপুণ এবং নিগূঢ় প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। বস্তিবাসীদের দৈনন্দিনতার বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটির পট উন্মোচিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত বস্তিবাসী প্যাঁকালের পরিবার। প্যাঁকালের অগ্রজ তিন ভাই—সোভান-বারিক-গজালে স্ত্রী এবং অনেকগুলো সন্তান-সন্ততি রেখে অকালে মারা যায়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-দুঃসহ বেদনা আর অসুস্থতায় ধুঁকতে ধুঁকতে গোটা

পরিবারটি যখন মৃত্যুর কাল গুণছিল, যখন এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ খোলা ছিল না পরিবারটির সামনে; ঠিক তখন খ্রীস্টান মিশনারীদের সহৃদয় ব্যবহার, নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরি ও আহার্যের বিনিময়ে প্যাঁকালে ও মেজবৌ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। অভাবের চরম বীভৎসতা নিয়ে পড়ে থাকলো মেজবৌ-র সন্তান ও পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যরা। মেজবৌ অবশেষে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করে এবং নিরন্ন-দরিদ্র শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহান সাধনায় ব্রতী হয়। একটি সুন্দর পরিবার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে বিপন্ন হয়ে গেল উপন্যাসের প্রথমার্ধের কাহিনীতে আমরা সে-চিত্রই পাই। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে এই ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষের কঠিন সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে আছে বিপ্লবের কথা, সাম্য-বাদী সমাজের কথা, দেশমাতার শৃঙ্খল মুক্তির ব্রতে জীবনকে তুচ্ছ ভেবে আত্মোৎসর্গের কথা, দেশপ্রেমিক সর্বহারা দলের অসীম সংকল্পের কথা। দ্বিতীয়ার্ধের কাহিনীর নায়ক আনসার, যে প্রথম জীবনে কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী থাকলেও অবশেষে বুঝেছিল যে 'চরকায় সুতো কেটে দেশকে স্বাধীন করা যায় না।' শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা জাগ্রত হলেই, আনসারের মতে, দেশকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন করা সম্ভব। তাই সে কৃষ্ণনগরে চলে আসে শ্রমিক সংঘ সংগঠনের আশায়। তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, মেথর, কুলি, মজুর—নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে। এবং এক সময় কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে তিলে তিলে ধুঁকে আনসারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধের কাহিনী সমাপ্ত হয়।

উপন্যাসে প্রধান চরিত্র মেজবৌ—সে-ই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুই কাহিনীর মৌল যোগসূত্র। 'মৃত্যুক্ষুধা'-র মেজবৌ চরিত্রটি নজরুলের চরিত্র-বিশ্লেষণ ক্ষমতার উজ্জ্বল উদাহরণ। মেজবৌ জীবন্ত এবং রক্তমাংসময় এক বিশিষ্ট চরিত্র। নজরুলের কথাসাহিত্যের মধ্যে, গভীরতর অভিনিবেশে, এ-কথা বলা যায় মেজবৌ চরিত্রটিই একমাত্র সম্পূর্ণাঙ্গ নারী-চরিত্র। দরিদ্র এবং বস্তিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব, পরিমিতিবোধ, সংযম, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, রুচিবোধ, বাস্তব জীবনদৃষ্টি—সবকিছু মিলে নজরুলের এ-চরিত্রটি অন্য সবার থেকে আলাদা এক স্বতন্ত্র নারীর প্রতিমূর্তি যেন—

বলা যায়, এই নারী নজরুলের মানসকন্যা। মেজবৌ তার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি দিয়ে সংসারের সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই বড়বৌ তার সম্পর্কে বলে, "সত্যি মেজবৌ, বড় ঘরে জন্মালে তুই জজ সাহেবের বিবি হতিস।" শাশুড়ীও মেজবৌকে ভয় পেতো, ভালোবাসতো। তাই মেজবৌ সম্পর্কে তার মনোভাবনা : "কিন্তু মেজবৌকে কেন যে তার এত ভয়, কেন যে ওকে আর বৌদের মত করে গালমন্দ দিতে পারে-না, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনা।" মেজবৌ-এর রূপ বর্ণনায় নজরুলের সতর্কতাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য---"দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন এতটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা ধোয়া চাঁদনীর মত আজও ঠিকরে পড়ছে রূপ।" শাশুড়ীর ভাষায় "ও যেন একটি আগুনের খাপরা"। এ-জন্যেই সৌন্দর্য এবং বৈধব্য সত্ত্বেও পাড়ার বখাটেরা মেজবৌর দিকে হাত বাড়াতে সাহস পায়নি। বরং সহমর্মিতা-সহযোগিতায় 'ও যেন পাড়ার ছেলে-মেয়ে সব্বারই আদরের দুলালী মেয়ে।'

অর্থের মোহে মেজবৌ রুচিকে কখনো বিসর্জন দেয়নি। বিবাহলিপ্সু সচ্ছল ভগ্নিপতিকে বিবাহ করার পরিবর্তে পরিহাসে, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে, ব্যঙ্গের খোঁচায় জর্জরিত করেছে মেজবৌ। খ্রীস্টান মিশনারীদের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার-সাহায্য-সেবা তাকে আকর্ষণ করেছিল। তাই সে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে, "শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয়না এসে, ঝ্যাটা মার নিজের জাতের মুখে। সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।" মেজবৌ ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ধর্ম ছাড়েনি, বরং জীবন-পিপাসার তীব্র টানেই সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই আনসারকে সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছে, "আমি ত হঠাৎ খ্রীস্টান হইনি। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীস্টান করেছেন।" সুতরাং স্বাধীন প্রাণচঞ্চল-জীবন-পিপাসু মেজবৌর এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অন্তরে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা অনুধাবনীয়। জীবনকে উপভোগ করায় মেজবৌ কোন পাপ দেখেনি, জীবনের পিপাসাই তার কাছে অধিক মূল্য পেয়েছে। কারণ সে জানতো, খ্রীস্টান হলে সে জ্ঞানচর্চা করতে পারবে, আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তার মন-মানসিকতাও হবে উন্নত। তাই মিস্ জোন্স যখন বলে, "ডেখো, টোমার মটো বুদ্ধিমতী মেয়ে লেখাপড়া শিখলে অনেক কাজ্ করটে পারে। টোমাকে ডেখে একটু লোভ হয় লেখাপড়া শেখাবার", তখন মেজবৌর অন্তরে জাগে জ্ঞানতৃষ্ণার বুভুক্ষা। তাই মসজিদের

আজান ধ্বনির কথা মনে ওঠায় অন্তরে পাপবোধ জাগলেও জ্ঞান-পিপাসার জন্য সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হলোনা। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধরণীয়:

> শুধু অর্থের প্রয়োজন পড়লে তার ভগ্নিপতিকে না হোক, অন্য কাউকে বিয়ে করে মেজবৌ সে চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পারত। কিন্তু তার ইচ্ছা শুধু বাঁচার নয়, তার পিপাসা জীবনের। কুণ্ডলায়িত ঐ পরিবেশের মধ্যে আটকে থেকে তার বৃহৎ জীবনের মৃত্যু হচ্ছিল তিলে তিলে, সেই কঠিন নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তার মত মেয়ের জীবনের পক্ষে বায়ুহীন, রুদ্ধশ্বাস গৃহ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনে সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৫]

বাৎসল্য-প্রেম মেজবৌ-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার খোকার আত্মা চিরকলের ক্ষুধা নিয়ে যাতে ফিরে না যায়, শুধু এ-জন্যেই সে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অবশ্য, এ প্রসঙ্গে, এ-কথাও বলা প্রয়োজন, কেবল বাৎসল্য-প্রেমই তাকে ফিরিয়ে আনেনি। আনসারের প্রেম-ভালোবাসাও তাকে আকর্ষণ করেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে লতিফাও তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আনসার ও লতিফার সান্নিধ্য ও ভালবাসা পেয়ে তার মধ্যে জাগলো সংসারে ফিরে আসার সুপ্ত বাসনা। অবশেষে এক-সময় যে-সন্তানের জন্য তার সংসারে প্রত্যাবর্তন, সে মারা গেল; শূন্যতায় পূর্ণ হলো মেজবৌ-এর অন্তর। সন্তান-হারানোর ব্যথা সে ভুলেছে দেশের অগণিত নিরন্ন শিশুর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে। এ-ভাবে মধ্যবিত্ত ঘরের এক বিধবা বধূ সংসারের সীমানা অতিক্রম করে সর্বজনীন মাতৃত্বের মহিমায় উন্নীত হয়েছে।

বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মুমূর্ষু-বিপন্ন যুবসমাজের বেদনা-যন্ত্রণা নজরুলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতো এবং সে-সূত্রেই এ-উপন্যাসে প্যাঁকালে চরিত্রের উজ্জ্বল নির্মিতি। আঠার-উনিশ বছর বয়সেই সংসারের ঘানি টানতে-টানতে বিপর্যস্ত এক দিশেহারা যুবকের নাম প্যাঁকালে। রাজমিস্ত্রীর কাজ করে মা-বিধবা তিন ভ্রাতৃ-বধূ, তাদের ডজনখানেক সন্তান এবং স্বামী পরিত্যক্তা পাঁচির মুখে অন্ন

দিতে প্যাঁকালে হয়ে-পড়েছে জীবনীশক্তিহীন নিরানন্দময় এক যুবক। তবু সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সংসার রক্ষার। তার আছে সুখে-বিলাসে জীবন কাটানোর আকাঙ্ক্ষা, চায় সে মুখ দেখার জন্য একটা দর্পণ কিনতে, কিন্তু পারেনা, কারণ সকলের মুখে ভাত জোগানোর জন্য আয়না কেনার পয়সা একসময় তাকে বের করতেই হয়। পিতৃহীন ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিগুলোর ক্ষুধার্ত মুখ তার আয়নার অভাবকে অভাব মনে করতে দেয়না। দুঃসহ অভাবের জীবনে তার বাবুয়ানার সখ দারিদ্র্যের পরিহাসে বার বার মুখ ফিরিয়েছে। তবু এই প্রতিকূল-জীবনেও প্যাঁকালের অন্তরে বইতো সতত স্নিগ্ধ লাবণ্য আর ভালো-লাগার বাতাস। মরুভূমিতে শীতল ফোয়ারার মত কুশির ভালোবাসা তার দেহ-মনে অনাবিল অবারিত প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে, কখনো কখনো কল্পনায় সে নীলিমা-ভ্রমণ করেছে। অবশেষে কুর্শিকে বিয়ে করার জন্যে সে ধর্ম ছেড়েছে।

প্যাঁকালে যেমন অনুভূতিপ্রবণ, তেমনি ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্র। তাই প্রতি-দ্বন্দ্বীর প্রতি কুর্শির সামান্যতম করুণা কি সুব্যবহার তাকে প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে তোলে এবং কন্নিকের আঘাতে কুশিকে করে তোলে রক্তাক্ত। নজরুল ইসলাম প্যাঁকালেকে যথার্থ অর্থেই রক্ত-মাংসময় এক জীবন্ত মানুষ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এ-চরিত্র নির্মাণে নজরুলের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে। প্যাঁকালে তার বাবুয়ানা, থিয়েটার, গান, জীবন ও জীবিকার কঠোরতর পথ-পরিক্রমাসহ যে স্বয়ং দুখু মিঞা তা বুঝতে কষ্ট হয়না।

নজরুল আপন মানস-ভাবনার অনুগামী করে নির্মাণ করেছেন 'মৃত্যু-ক্ষুধার' অন্যতম পুরুষ চরিত্র আনসারকে। উদ্দাম জীবন-পিপাসু রাজ-নীতি-সচেতন এবং দ্যুতিময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী নজরুল আলোচ্য উপন্যাসে যেন আনসার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।[৬] আনসার এ-উপন্যাসের নায়ক। তার চরিত্র-ব্যক্তিত্ব-কর্মধারা-আচার-আচরণ-উচ্চা-রণ—সবকিছুই আবেগ এবং ভাবালুতা-নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসে আনসারের উপস্থিতি অনেকটা আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং অসার্থক—ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য আর বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই তাকে কাহিনীর মধ্য-স্রোতে জোর করে আনা হয়েছে। ফলে চরিত্রটি হয়ে পড়েছে কৃত্রিম এবং তার উপস্থিতি থেকেই কাহিনী হয়ে পড়েছে সংহতিহীন, যেন

উপকাহিনী ভারাক্রান্ত। উপন্যাসের সমাপ্তিতে তার প্রতি মেজবৌয়ের অব্যক্ত দুর্বলতা তাকে নায়ক হতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে ; কিন্তু নায়ক হবার মতো অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্যই নেই তার চরিত্রে, পারেনি সে সকল কাহিনীকে সুদৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। নজরুলের অপর উপন্যাসদ্বয়ের নায়ক ('কুহেলিকার' জাহাঙ্গীর এবং 'বাঁধনহারা'-র নূরুল হুদা) যেমন দেশপ্রেম আর সর্বহারার দুঃখ-মোচনের ব্রত নিয়ে সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, আনসারও ঠিক তেমনি সংগ্রামী চরিত্র। নজরুলের ত্রয়ী নায়ক একই আদর্শের পূজারী।

আনসার সংগ্রামী হলেও জীবনরস-বিমুখ নয় ; সে কৌতুকপ্রিয়, হাস্যোচ্ছল এবং জীবনানন্দে ভরপুর। নিখুঁত সৌন্দর্যের অধিকারী এবং বিত্তশালী মুসলমান পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার পোশাকে 'চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে' এবং তাকে 'বস্তা' বলে ভ্রম হয়। 'মাথায় সৈনিকদের ফেটিগ-ক্যাপের মত টুপি, তাতে ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস, আর সেই ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ত্রিশূল... সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলা আয়ত্তের ছাপ'—ইত্যাদি বর্ণনায় আনসারের অন্তর্প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির সুষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের দেনা-পাওনার বন্ধন উপেক্ষা করে আনসার প্রলয়-নেশায় মেতে উঠেছে ; মায়ের স্নেহ, আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর-যত্ন, প্রেয়সীর মায়াডোর ছিন্ন করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বার বার তুচ্ছ মনে করেছে আনসার। ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তির অভাব না থাকলেও ঘরকে পর করে দিয়ে জেলখানার দুর্ভার জীবনকে সে সঙ্গী করে নিয়েছে নির্দ্বিধায়।

আনসারের এতসব গুণাবলী সত্ত্বেও, সে আন্তরিকতা-বলিষ্ঠতা জীবনের সম্পূর্ণতার অভাবে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। কর্মের চেয়ে তার প্রেমের বর্ণনায় উপন্যাসে অযথা কালক্ষেপণ করা হয়েছে। বিপ্লবী এবং সার্থক সমাজকর্মী হয়ে জনগণের ভালবাসা সে পেয়েছে, কিন্তু উপন্যাস-পাঠকের হৃদয়-দ্বারে পৌঁছে যাবার যথার্থ আকর্ষণী শক্তি তার চরিত্রে নেই। চরিত্রটিকে যেভাবে শুরু করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার স্বাভাবিক দীপ্তি অম্লান থাকেনি। উপন্যাসের শেষ দিকে আনসারের দেশপ্রেমের মহান আদর্শের পরিবর্তে তার সঙ্গে রুবির প্রেমের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক অধিক মনোযোগী হয়েছেন। ফলে,

চরিত্রটির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যর্থ হয়েছে। তবুও এ-কথা স্বীকার্য যে, দেশ ও জাতির মঙ্গলকাঙ্ক্ষায় সব ধরনের আসক্তিবর্জিত আনসার নজরুলের বিপ্লবী-সত্তারই জীবন্ত প্রতিনিধি।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে রুবি আলোচ্য উপন্যাসের একটি উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র। দেশ বা সমাজ তার কাছে বড় কথা নয়, বরং প্রেমকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভেবেছে। ভালবাসার ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিয়েছে সে পিতামাতার ওপর বৈধব্যের আড়ম্বর প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। যে-হৃদয়ে আনসার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, সেখানে স্বামীকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই ঠাঁই দিতে পারেনি রুবি। ভালবাসা তার হাতের স্পর্শে সার্থক হয়ে উঠেছে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত আনসারকে সেবা-যত্ন করে আত্মাহুতি দেয়ার মধ্য দিয়ে। রুবির ভালবাসা কিংবা বৈধ-ব্যের সাজ কোনটাই নিস্তরঙ্গ নদীর মতো নয়; অন্তরের গভীরে যে অস্থির-উদ্দামতা রয়েছে তা বুঝা যায় লতিফার সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। 'রুবি বিলাসী শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক প্রণয়িনী। প্রেমিকের মৃত্যুতে তারও মৃত্যুকামনা রোমাঞ্চকর, কিন্তু জীবনবিরোধী।'[৭] রুবি একান্তভাবেই আবেগশাসিত এবং সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্র।

অপ্রধান এবং মধ্যবর্তী চরিত্র নির্মাণেও নজরুল ইসলাম সূক্ষ্ম পর্য-বেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে নজরুল যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, এ-সব চরিত্রের উপাদানপুঞ্জ সেই অভিজ্ঞতা লোক থেকেই আহৃত হয়েছে। কোন্দল-পরায়ণা প্যাঁকালের মা ও হিড়িম্বা, বড় বৌ, মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর সেজবৌ, তাদের ক্ষুধা-পীড়িত সন্তান-সন্ততি, স্বামী-পরিত্যক্তা পাঁচি, প্রেম-প্রত্যাশী কুর্শি, বিবাহলিপ্সু ঘিয়াসুদ্দীন ওরফে ঘাসু মিয়া, লতিফা, নাজির হোসেন, প্যাঁকালের প্রতিদ্বন্দ্বী রোতে, মোড়ল-মৌলবী, খ্রীস্টান পাদ্রী, মিস জোন্স—এ-সব চরিত্র-সৃষ্টিতে নজরুলের সতর্কতা, প্রযত্ন এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবনদৃষ্টির প্রকাশ, যা উপন্যাসের অন্যতম ধর্ম, এই চরিত্রাবলীর মাঝে লক্ষণীয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই বস্তিবাসী প্যাঁকালে-পরিবারটির দুঃখ-যন্ত্রণা দৈনন্দিনতা নজরুল বাস্ত-বতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিস্মৃত হননি সেইসব

মোড়ল-মৌলবীর চরিত্র, যারা ধর্মের নামে ব্যবসা করে সাধারণ মানুষের অসহায়তা-দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তাই দেখি, মেজবৌ খ্রীস্টান হয়ে গেলে পাড়ার মোল্লা-মৌলবীদের তৎপরতা :

> পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ী মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ঈমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন।... মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই হযরত পীর গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে এই গোমরাহ্ বেদীনদের নসিহত ও দরকার হলে 'বহস' করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাততঃ তার বাড়ীর ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনর টাকা যোগাড় করে দেবে, নইলে সমাজে সে 'পতিত' হয়ে থাকবে।

—মৌলবী-মোল্লাদের এই তৎপরতায় আনসারের মনে ঘৃণার জন্ম হয়। তাই এ-সব দেখে-শুনে আনসার বলে ওঠে :

> মেজবৌ হল খ্রীস্টান, লাভ হল পীর আর মওলানা সাহেবদের। আর মড়ার উপর খাড়ার ঘা— বেচারী প্যাঁকালের মা'র কপাল ত এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকী ছিল— মোল্লাজি তা শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালেরা ঘর-গোষ্ঠী মিলে খ্রীস্টান হয়ে গেছে বঁুচি, তাহলে আমি কিছু বলব না।... ওই ছাগল ক'টাইত ওর সম্বল— তাই ওকে বিক্রি করতে হবে, নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

উপন্যাসের যে অন্যতম ধর্ম সমাজবীক্ষণ, 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। একটি বিশেষ সময়ের বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির অন্তরস্বরূপ এ-উপন্যাসের শরীরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং এ-হিসেবে একে বাঙালির সমাজ-ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বের শৈল্পিক দলিল হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুল বিষয় এবং বক্তব্যেই অধিক মনোযোগী ছিলেন; প্রকরণ-পরিচর্যায় তিনি তেমন যত্নশীল বা সতর্ক ছিলেন না। তবুও প্রকরণ-প্রসাধনে, বিশেষত ভাষা-ব্যবহারে, তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। ভাষা-প্রয়োগে নজরুলের কবিসত্তা সর্বদা অলক্ষ্যে কাজ করছে, ফলে তাঁর উপন্যাসের ভাষায় এসেছে কবিতার লাবণ্য। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের ঘটনাংশ সংঘটিত হয়েছে কৃষ্ণনগরে। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই, নজরুল সতর্কতার সঙ্গে এ-উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করেছে; ফলে চরিত্রের বাস্তবতা হয়েছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "ভাষার উপরে নজরুলের যে কত বড় দখল ছিল তাও দেখা যায় তাঁর... উপন্যাসগুলোতে। বাক্‌বিন্যাসে কৃষ্ণনগরের বাকভঙ্গী, চটুলতা এবং ইডিয়ম অনায়াসে ব্যবহার করে ভাষার প্রাণশক্তি ও ধারণ-ক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি কাব্যিক বর্ণনায় ভাষাও হয়েছে অপরূপভাবে লীলায়িত। বর্ণনাভঙ্গীর সাবলীল স্নিগ্ধ মাধুর্যে প্রত্যেকটি উপন্যাসই হয়েছে এক একটি গদ্যকাব্য। তাঁর গদ্য-রীতি থেকে উপন্যাস-বর্ণিত কাহিনী-অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সহজ নয়। কাহিনী যেমন শিথিল-বিন্যস্ত, ভাষাতেও তেমনি পড়েছে তাঁর দুরন্ত কবিমন ও দুর্বার যৌবনের গতিমুখর ছাপ।"[৮] এই উক্তির সমর্থনে আমরা উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে তুলে ধরছি একটা উজ্জ্বল এলাকা:

> মেজ-বৌর বোনের সোয়ামী সত্যিই বড়লোক, কলকাতার চামড়াওয়ালা। আগে তার নাম ছিল ঘাসু মিয়া, এখন সে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ। পূর্বে সে ঘোড়াগাড়ী চালাত, এখন ঘোড়াগাড়ীই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'ঘিয়াসুদ্দীন' নামে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর শ্বশুর-বাড়ী মাড়ায়নি। স্ত্রী তার চির-রোগী। কাজেই বিয়ে তাকে আরও দুটো করতে হয়েছে। সে বলে এক বিবিতে ইজ্জত থাকে না লোকের কাছে। তার শালী অর্থাৎ মেজ-বৌকে সে আগেই দেখেছিল। কাজেই মেজ-বৌ বিধবা হবার পর থেকেই তার শ্বশুর-বাড়ীর দিকের টানটা আবার নতুন ক'রে আরম্ভ হয়েছে।

বাস্তব জীবন থেকে চয়ন করা হয়েছে বলে উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক এবং গ্রাম্যভাষা সজীব এবং ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও, ঔপন্যাসিক, সাধারণ কথার অন্তরালে গভীরতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। যেমন:

ক. প্যাঁকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "বড়বৌ, ভীষণ অন্ধকার। আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কৈ?"

খ. ...চালের খড় তখনো ধু ধু করে জ্বলছে, ওদের বুকের আগুনের মতো।

গ. "আচ্ছা দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেই বেশী দূর, না মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশী দূর?" শান্ত বৃদ্ধ ছটফট করে ওঠে..."ঐ বরিশাল বেশী দূর, ঐ বরিশালই বেশী দূর।"

ঝগড়ার দৃশ্যে ক্রুদ্ধ কথোপকথন এবং পরিবেশ-নির্মাণের বেলায় উপমা-প্রয়োগ আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন:

ক. অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা'র মত ক্ষুরধার না হ'লেও তার শরীর এবং স্বর এ দু'টোর তুলনা মেলেনা!—একেবারে সেকালের ভীমকান্তা হিড়িম্বাদেবীর মতই!

খ. গজালের মা গজালের মতই সরু—হাড্ডি-চামড়াসার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা'র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায়না।

উপমা-উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে নজরুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অভিজ্ঞতালোক থেকে উপমার উপাদান সংগ্রহ করেন। যেমন:

ক. অদূরে, বাবুদের শখের বাড়ীর বিলিতি তালগাছগুলো সারি-সারি দাঁড়িয়ে, তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ—যেন ইমামের পিছনে অনেকগুলো লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে—সামনে শুক্‌নো বাগানটায় জানাজার নামাজ।

খ. লতিফার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক নিমিষে ম্লান হয়ে গেল, শিশুর হাতের রংমশাল নিবে যাবার পর তার দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হয়ে উঠে তেমনি।

গ. ঐ দূর ছায়াপথের নীহারিকা-লোকের মতই নারীর মন রহস্যময়।

ঘ. সন্ধ্যার নামাজ, যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ কামনা।

ভাষার মধ্যে নজরুল কখনো কখনো গীতিময়তারও সঞ্চার করেছেন। যেমন :

> মাঝে মাঝে মনে হয়---মনে হয় ঠিক না, লোভ হয়---যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই---জেনে যাই! আমার মরুভূমির উর্ধ্বে সাদা মেঘের ছায়া নয়, কালো মেঘের ছায়াঘন মায়া দেখে যাই। তোরই চিঠিতে জেনেছি সে মেঘ নাকি তোরি দেশে গিয়ে জমেছে—তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে ?[৯]

বিষয় ভাবনায় নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। মৃত্যু আর ক্ষুধাময় এই উপন্যাসে নজরুল কল্যাণ, মঙ্গল আর স্বাধিকারের বাণী প্রচার করেছেন। বাংলা উপন্যাসে বস্তিবাসী মানুষের দৈনন্দিনতাকে উপজীব্য করে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনা নজরুলের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক-প্রতিভার পরিচয়বাহী।

তথ্যনির্দেশ

১ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, "কাজী নজরুল ইসলাম : গদ্যের উপন্যাস", নজরুল গদ্য-সমীক্ষা (সম্পাদক---মুহম্মদ মজিরউদ্দীন), ১৯৭৮, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩

২ মুহম্মদ আবদুল হাই, "ঔপন্যাসিক নজরুল", নজরুল সমীক্ষণ (সম্পাদক---মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), ১৯৭২, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. দুইশ' ষাট।

৩ রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, ১৯৮২, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৩৪-৪১

৪ সাইদুর রহমান ভুঁইয়া, "নজরুল ইসলামের উপন্যাস", 'সাহিত্য পত্রিকা' (সম্পাদক—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), উনত্রিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃ. ৫৩

৫ শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল-সাহিত্য বিচার, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ১১৫-১৬

৬ রাজিয়া সুলতানা, কথাশিল্পী নজরুল, ১৯৭৫, মখদুমী অ্যাণ্ড আহসানউল্লাহ্ লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ৪৩

৭ আতোয়ার রহমান, "কথাশিল্পী নজরুল", নজরুল-সাহিত্য (সম্পাদক-মীর আবুল হোসেন), ১৯৬০, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ. ১৬০

৮ মুহম্মদ আবদুল হাই, "উপন্যাস রচনায় নজরুল", নজরুল-পরিচিতি, প্র. সং. ১৯৫৯, তৃ. মু. ১৯৬২, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ঢাকা, পৃ. ৯৮

৯ নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস আলোচনায় আমরা ব্যবহার করেছি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড-প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)-র প্রথম সংস্করণের (১৯৬৭) পাঠ।